আমার ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

কাইউম পারভেজ

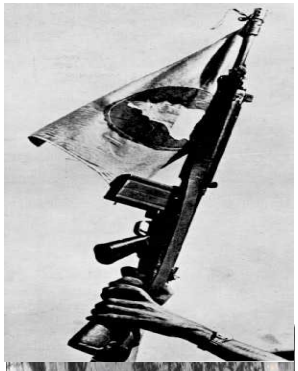

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। আমি সেদিন খুলনা শহরে। ৬ ডিসেম্বর যশোর হানাদার বাহিনীর হাত থেকে যশোর মুক্ত হলো। খবরটা আগের থেকে জানতাম। সহযোদ্ধা বন্ধু মানিক আগেই সেটা জানিয়ে গেছে গোপনে এবং আমাদের কী কী করণীয় তার একটা নির্দেশ দিয়ে গেছে। মানিক অবশ্য নিশ্চিত করে ৬ তারিখের কথা বলেনি - বলেছিলো প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মুক্তি বাহিনী মিত্রবাহিনীর সহায়তায় যশোর দখল করবে। ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই যশোরে গৃহবন্দীর দশা থেকে শুনতে পাচ্ছি ভারী কামান আর গোলার শব্দ। যতই দিন যাচ্ছে সে শব্দ আরো কাছে চলে আসছে। অবশেষে বিশাল এক গোলা এসে পড়লো আমাদের বাসার সামনের দমকল অফিসের মাঠে। এরপর মনে হলো আমাদের বাড়ীর চারদিকে যেন গোলাগুলি কামান গোলার শব্দ। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনছি যশোর মুক্ত হলো। প্রথম মুক্ত জেলা। এক সময়ে দেখি মানুষ যে যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। শহর খালি হয়ে যাচ্ছে। আসলে কী ঘটছে কেউ জানে না - প্রাণের ভয়ে সব ছোটাছুটি করছে সেই গোলাগুলির মধ্যেই। আমার তো কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি বন্দী পাকসেনাদের নজরে। আমার বাড়ীতে আমাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে -আমার কোর্ট মার্শাল হবে। সকাল বিকাল শর্ত অনুয়ায়ী সেনারা খোঁজ নিচ্ছে আমি আছি না পালিয়েছি। শর্ত হলো আমি পালালে আমার পুরো পরিবারকে এবং যে দু'জন জামিনদার ছিলেন তাঁদের পরিবারসহ সকলকে মেরে ফেলা হবে।

এই গোলাগুলির মধ্যেই আমার ফুপাতো বোনের স্বামী রফিকউল্লাহ তাঁর পরিবারসহ কোত্থেকে একটা বাস জোগাড় করে এনে আমাদের বাসায় এসে বললেন - এখনই পালাতে হবে। পাকসেনাদের সাথে মিত্রবাহিনীর প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছে। আমি বললাম আমার তো যাবার উপায় নেই। আপনি বাকী সবাইকে নিয়ে যান। দুলাভাই বললেন তোমাকে যারা বন্দী করে রেখেছে তারাও সব ভাগোয়াট। আমি যাবো না। কারণ মানিকের সাথে আমাদের অপারেশনের প্লান করা হয়ে আছে। মুক্তিবাহিনী শহরে প্রবেশ করলে আমাদের কী কী করনীয়। যাহোক আমার কথায় কর্ণপাত না করেই একপ্রকার টেনেহিঁচড়ে আমাকে বাসে তোলা হলো। আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমরা যাচ্ছি রাস্তায় দেখি শ'য়ে শ'য়ে আর্মি ভ্যানে পাকসেনারাও ভাগছে। তখন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্লেন থেকে জেনারেল ম্যানেক শ'র নামে লিফলেট ছড়ানো হচ্ছে আত্মসমর্পণ করার জন্য এবং বলা হচ্ছে যদি পাকসেনারা আর কোন গোলাগুলি না করে, প্রতিরোধ না করে তবে তাদের জানমালের রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। এবং সব পাকসেনাকে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে জড়ো হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আত্মসমর্পণের জন্য। ওদিকে ভারতীয় যুদ্ধ বিমানগুলো উপর থেকে শেলিং করে যাচ্ছে। দুলাভাই দেখলাম তাঁর পরিচিত একজনের বাসায় আমাদেরকে এনে তুললেন।

অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর খুলনা মুক্ত হলো। খুলনা বিভাগে অবস্থানরত সব পাকসেনা এসে জড়ো হলো খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে।

ওদিকে বন্ধু মানিক, সাধন আর অন্যরা এক জীপ নিয়ে এসেছে আমাদের যশোরের বাসায়। বাড়ী ফাঁকা দেখে ওরা ভেবেছে আমাদেরকে বোধহয় মেরে ফেলা হয়েছে। এদিক ওদিক আমাদের খোঁজ করে না পেয়ে ওরা ছুটলো খুলনার দিকে। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে বাসায় কাওকে না জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম সার্কিট হাউসের উদ্দেশে। আত্মসমর্পণ দেখবো আর খুঁজবো আমার সাথীদের যাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। রাস্তায় কেবল লাশ

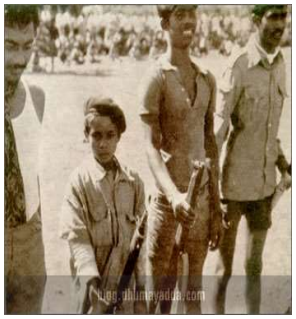

আর লাশ। শেষ মূহুর্তে খুলনা শহরের বিহারী এবং রাজাকাররা যত্রতত্র বাঙালী খুন করে রাস্তার পাশে এবং ড্রেনে ফেলে রেখেছে। গা ছিম ছিম করছে। মেজর আকরামের হাতে ধরা পড়ার পর পাকসেনাদের অত্যাচারের কথা মনে পড়ছিলো। পাকসেনাদের সাথে বিহারীরাও পালাচ্ছে কিন্তু যাবার পথে যাকে পাচ্ছে তাকেই হয় গুলি করছে নয় কোপাচ্ছে। হঠাৎ একটা হুড খোলা জীপ দ্রুত আমার সামনে দিয়ে গেল আবার প্রচন্ড ব্রেক কসে পেছনে আসতে লাগলো। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম ভাবলাম বিহারীরা বোধ হয় আমাকে বাঙালী হিসেবে সনাক্ত করে ফেলেছে। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহকে স্মরণ করে বললাম তুমি অলৌকিকভাবে আমাকে মেজর আকরামের হাত থেকে বাঁচিয়েছো এবার এদের হাত থেকে বাঁচাও। আমার পাশে জীপটা থামতেই 'জয় বাংলা' বলে মানিক আর সাধন জীপ থেকে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য হাতে একটা এসএমজি ধরিয়ে দিয়ে বললো গাড়ীতে ওঠ। আগে সার্কিট হাউসে যাবো।

১৯৭১-এ ১৬ ডিসেম্বর খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে অস্ত্র হাতে আমরা সহযোদ্ধা বন্ধুরা। অবলোকন করছি, মিত্র বাহিনীর কমান্ডে যে পাক সেনা গুলোকে ধাওয়া করে যশোর থেকে খুলনায় এনে জড়ো করা হয়েছে ওদের আত্মসমর্পন। দূর থেকে দেখছি সেই মেজর আকরামকেও যার হাতে আমি বন্দী হয়েছিলাম এবং যার কারণে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছিলাম - সেই মেজর আকরামকে দেখছি এক এক করে কোমরের পিস্তলসহ বেল্ট, সোল্ডারের র‍্যাঙ্কব্যাজ খুলে সামনে মাটিতে রাখছে। টকটকে ফর্সা মুখমন্ডল তখনো সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। আস্তে মানিককে বললাম - মেজর আকরামকে কি কোনভাবে বাঁচানো যায় না? মানিক আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ওর হাতে থাকা এসএমজিটা আমার বুকে ঠেকিয়ে বললো - শালা তুই মেজর আকরামের হাত থেকে বেঁচে গেলেও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবি না। তখন এক উত্তেজনার সময়। সবাই উত্তেজিত। আমি বললাম - মানিক, নরপশু মেজর আকরামের ভেতরে যে এক কোমলমতি মানুষ বাস করছে তাকে তোরা দেখিসনি। আমি দেখেছি। আমরা বাঙালিরা ইপিআর-এর হেড কোয়ার্টারে ওর চোখের সামনে ওর ছোট মেয়ে আর বউটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে ও হিংস্র হয়ে গেলো। যাকে ধরছে তাকেই মেরে ফেলছে। শুধু বাদ গেলাম আমি। ওর মেয়ের মত দেখতে আমার ছোট বোনের অশ্রু আর আকূতি ওর হিসাব নিকাশ সব ওলোট পালট করে দেয়। মেজর আকরাম আমাকে প্রানে না মেরে আমার কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করে। আমার বুকে রিভলবার ধরেও আমাকে ছেড়ে দেয়। তোকে ঘটনাটার মাত্র বিশ শতাংশ বললাম। বাকীটা শুনলে তুইও হয়তো আমার মত করে ভাবতি - মেজর আকরামকে বাঁচানো যায় কি না! সেটাই বল তুই ধরা পড়লি ক্যামনে?

সেই রাতে তুই যখন আমার সাথে দেখা করে চলে গেলি তার কয়েকদিন পর হঠাৎ একদিন রাতে আমাদের বাড়ীটা ঘিরে ফেললে পাকসেনারা মেজর আকরামের নেতৃত্বে। বারান্দায় ভারী বুটের শব্দ পেয়ে আমার মেজো বোন আব্বাকে বললো আব্বা আমদের বাড়ীতে মনে হয় আর্মি এসেছে আমি ওদের বুটের শব্দ পেয়েছি আর ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। আমি তখন আম্মার সাথে ট্রানজিস্টারের কাছে মাথা রেখে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছি। আব্বা এসে আমাকে আস্তে করে ডেকে বললেন বাবা ওরা টের পেয়ে গেছে তুমি এখানে। তোমাকে বোধহয় ধরতে এসেছে। তুমি আমাদের পুকুরের কচুরীপানার মধ্যে ডুব দিয়ে থাকো। উঠানে লাফ

দিয়ে পুকুরের দিকে যেতেই হল্ট হল্ট শব্দে থমকে গেলাম। হ্যান্ড্স আপ। তারপর এলো পাথারি রাইফেলের বাড়ি। আমি জানতাম না ওরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে আছে। তাড়াতাড়ি আমার হাত আর চোখ বেঁধে পিছনের দরজা দিয়ে ওদের গাড়ীতে তুললো। বুঝতে পারছি শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝরছে। ওদিকে সামনের দরজা খুলতেই মেজর আকরাম আব্বার বুকের ওপর পিস্তল ধরে বলছে তোমার ছেলে কোথায়? ততক্ষণে বাড়ীতে কান্নার রোল। মেজর আকরামকে জানানো হলো শিকার আয়ত্বে। কিছুক্ষণ পর মেজর আকরাম গাড়ীতে এলো। গাড়ী চলতে শুরু করলো। কোথায় যাচ্ছি জানিনা।

একসময়ে গাড়ী থামলে আমাকে লাথি দিয়ে গাড়ী থেকে নামানো হলো। তারপর বুঝতে পারলাম আমি কোন এক ঘরে। এবার শুধু আমার চোখের বাঁধনটা খোলা হলো। হাতে হ্যান্ড কাপ। চোখ খুললে বুঝলাম যশোর কোতয়ালী থানার হাজত ঘরে আমি। যেখানে চারজন মানুষ ঠিকভাবে বসতে পারে না সেখানে প্রায় চল্লিশজন মানুষ। সবাই আমার মত আহত। কেউ কাতরাচ্ছে কেউ অচেতন। চারিদিকে রক্ত, আর প্রস্রাব থৈ থৈ করছে। পরে জেনেছি ওদেরকে দিন কয়েক ধরেই ধরে আনা হচ্ছে এবং যখন খুশী বিশেষ ঘরে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে।

হাত বাঁধা অবস্থায় অর্ধচেতন পড়ে আছি। হঠাৎ চোখে পড়লো হাফিজ ভাইয়ের দিকে। আমার সহযেঅন্ধকারে নির্যাতনে বিভৎস চেহারাটা চিনতে পারিনি প্রথমে। চোখাচোখি হতে বললেন আমরা কিন্তু কেউ কাওকে চিনি না।

ভোরের আজান শুনতে পারছি। সেদিন বোধহয় ঈদের দিন। রাজাকার আর বিহারী পুলিশরা নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার ঈদ মুবারক ধ্বনি দিচ্ছে চারিদিকে। এক সময়ে এক বিহারী সেন্ট্রীকে বললাম আমাকে একটু পানি দেবে?। অট্টহাসি দিয়ে বললো - তুমি পানি খাবে? বেশ হা কর আমি পেশাব করে দিচ্ছি আপতত ওটাই পান করো। কথাটা নিজের ঘরে বসে ওসি সাহেব শুনেছিলেন। আজানের সময় যখন আমাকে তাঁর ঘরে নেওয়া হলো তিনি সেন্ট্রীকে ইংরেজীতে আদেশ করলেন আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দিতে। তারপার একগ্লাস পানি এনে দিতে বললেন। আমাকে পানিটা খেতে বললেন। পানিটা খেয়ে আমি এবার খুব কাঁদলাম। বললাম জীবনের প্রথম হাতকড়া পরলাম। এবার ওসি সাহেব বাংলায় বললেন চুপ করুন। সারা দেশের হাতে হাত কড়া আর আপনি .. তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম আপনি বাঙালী? বললেন ওরা (সেন্ট্রীরা) শুনতে পাবে ইংরেজী বলুন..। আমি এখন আপনার জবানবন্দী তৈরী করবো। যা প্রশ্ন করবো তার উত্তর দেবেন। নানা জেরা তাঁর। এক পর্যায়ে বললেন আমি একটা ব্যাপারে অবাক হচ্ছি যে মেজর আকরাম কাওকে ধরলে ফুলতলা ব্রিজে নিয়ে মেরে ফেলে কিন্তু আপনাকে কেন হাজতে রেখে গেলো। যাবার সময় বললো আপনার যাবতীয় কাগজপত্রসহ আপনাকে ক্যান্টনমেন্টে চালান করতে আপনার কোর্ট মার্শাল হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম আমার অপরাধ? বললেন ১. আপনি ইপিআর এর সুবেদার মেজর ওয়ারিস খানের কাছ থেকে ওদের অস্ত্রগারের (কোথ) চাবি জোর পূর্বক কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর ঠান্ডা মাথায় আরো কয়েকজনকে নিয়ে তাকে হত্যা করেছেন। ২. কোথ লুট করে সব অস্ত্র ইপিআর এর বাঙালী সিপাহী এবং অন্যান্য মানুষের কাছে বিলি করে যশোর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। ৩. আপনি নড়াইল এলাকায় পাকিস্তানী জোয়ানদের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। গোলাগুলি করেছেন। ৪. আপনি এবং আপনার সাথে আরো দুজন মিলে আপনারা হাতে লিখে পত্রিকা এবং পোষ্টার তৈরী করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করার চেষ্টা করেছেন।

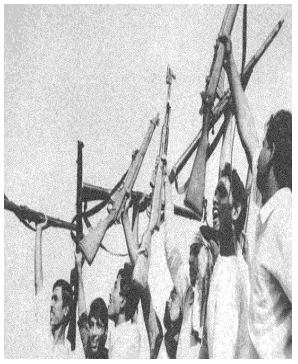

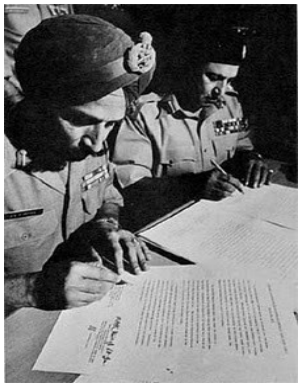

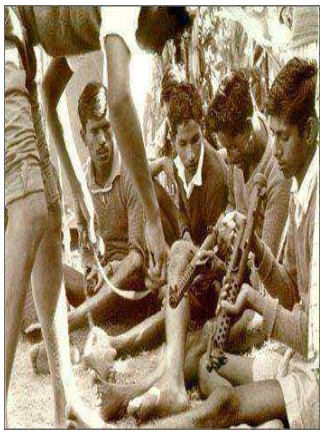

তার কপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। ৫. আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) হয়ে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন এবং তাদের নির্দেশ মত রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করে চলেছেন।

আমি অবাক হয়ে গেছি। গত আট মাসের সমস্ত খবর ওদের কাছে আছে। বাঙালী ওসি বলে তাঁর কাছে অকপটে সব স্বীকার করেছি। তিনি বললেন কনগ্রাচুলেশনস। ঘাবড়াবেন না। মেজর আকরাম যখন মারেনি তখন হয়তো আর প্রাণে মারবে না তবে কী করবে আমি জানিনা।

দুদিন পর আমার জামিন হলো শর্ত সাপেক্ষে। আমি বাড়ীতে থাকতে পারবো কিন্তু যে কোন মুহূর্তে ওরা আসলে আমাকে যেন বাড়ীতে পাওয়া যায় নইলে আমার জামিনদার এবং আমার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হবে। বাড়ীর কাছেই মেজর আকরামের অফিস। যাতায়াতের সময় দুবেলা খোঁজ নিতো আমি আছি না পালিয়েছি।

এরপর তোরা যখন যশোরে ঢুকলি ওরা পালালো খুলনায় - আমরাও চলে এলাম খুলনায়।

আত্ম সমর্পণের পর সবাই ক্ষুধার্তু। এক রেষ্টুরেন্টে ঢুকলাম। ওখানে বসচা চলছে মালিকানা নিয়ে যেহেতু ওটা ছিলো বিহারীর। আমরা সাতজন। সবার কাঁধে অস্ত্র। ওরা একটু ঘাবড়ে গেলো। আমাদেও সার্ব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কে কী খাবে অর্ডার দিচ্ছে। আমি মুরগী খাসি গরু তিনটারই অর্ডার দিলাম আমার জন্য। বন্ধুরা সব আমার দিকে তাকিয়ে। বললাম কিছু মনে করিস না গত নয় মাস আমি মাছ মাংস স্পর্শ করিনি। আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো দেশ স্বাধীন করে তারপর মাছ মাংস খাবো।

সেদিনই সবাই মিলে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে যশোর ফিরে এলাম। তারপর যশোর সার্কিট হাউসে মেজর এম এ মঞ্জুরের (আট নং সেক্টর কমান্ডার) হেড কোয়ার্টাওে রিপোর্ট করলাম । তারপর মেজর মঞ্জুরের নির্দেশ অনুযায়ী শহর নিয়ন্ত্রনের কাজে লেগে পড়লাম। চারিদিকে তখন বারুদ আর লাশের গন্ধ। স্বাধীনতার গন্ধ।